ঈশ্বরের অস্তিত্ব - সৃষ্টির যুক্তির খন্ডন

(A REFUTATION OF THE DESIGN ARGUMENT FOR GOD)

- অপার্থিব জামান

E-mail: aparthib@yahoo.com

ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমর্থনে একটা যুক্তির অবতারণা আস্তিকরা প্রায়েই করে থাকেন, যা সৃষ্টির যুক্তি বা Argument From Design নামে পরিচিত। এই যুক্তির সারমর্ম হল এই যে আমাদের এই বিশ্ব ও প্রকৃতি যে এত শৃঙ্খলাবদ্ধ, বিধিনিয়ন্ত্রিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এমনটি পরিলক্ষিত হওয়ার একটাই ব্যাখ্যা যে এর পেছনে সচেতন কোন সত্তা আছেন। যেখানেই বিধি আছে সেখানে বিধানকর্তা থাকতে বাধ্য। যেখানে সৃষ্টি, সেখানে সৃষ্টিকর্তা থাকতে বাধ্য। এই রকম যুক্তি সর্বসাধারনের মনে সাধারণ চিন্তা হিসাবে আসাটা স্বাভাবিক। এটা একটা অতি পুরাতন ভাবনা ও যুক্তি। কিন্তু সাধারণ চিন্তায় যা আসে তা যে সর্বদাই ধ্রুব সত্য হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। পরে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আসব। ইদানিং বিজ্ঞানের কিছু নতুন ধারণা ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টির যুক্তির একটা নতুন সংস্করণের অবতারণা করা হয়েছে। এটাকে বলা হয় বুদ্ধিমান সৃষ্টির যুক্তি বা Intelligent Design Argument । বিজ্ঞানের এই নতুন প্রজ্ঞা হল, প্রাণের অস্তিত্বের জন্য যে বেশ কতকগুলো সূক্ষ্ম সমন্বয়ের (Fine Tuning) প্রয়োজন, তার সবটাই ঘটতে দেখা যায় বাস্তবে। যেমন মহাকর্ষ বা তড়িৎচুম্বকীয় বলের সামান্যতম তারতম্য হলে গ্রহ নক্ষত্র তথা প্রাণের সৃষ্টি হতে পারতনা। অঙ্গার (কার্বন) এর একটা বিশেষ শক্তির স্তর না থাকলেও প্রাণের সৃষ্টি হতে পারতনা, ইত্যাদি। পদার্থবিজ্ঞানের কয়কটি মৌলিক ধ্রুবকের (Fundamental Constants) মানের সূক্ষ্ম সমন্বয় না ঘটলে প্রাণের বিকাশ ঘটতে পারতনা। প্রাণ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় এইরকম সূক্ষ্ম সমন্বয় বাস্তবিকই ঘটতে দেখা যায়, যা ঘটার কোন আপাত কারণ নেই। এটা কাকতালীয় হওয়ার সম্ভাবনাও অতি ক্ষুদ্র (অন্তত তাই মনে করা হয়। আসলেই ক্ষুদ্র কিনা সেটা তর্কসাপেক্ষ, পরে বিশদ আলোচনায় যাব) । তাই একমাত্র প্রাণ সৃষ্টির জন্যে কোন সচেতন সত্বার বুদ্ধিমান অভিপ্রায়ের দ্বারাই এই সূক্ষ্ম সমন্বয় ঘটা সম্ভব। আর এই সচেতন সত্বাই ঈশ্বর। এটাই হল বুদ্ধিমান সৃষ্টির যুক্তি। এই যুক্তির অন্তর্নিহিত ত্রুটি নিয়ে পরে আলোচনায় আসব। আগেই বলে রাখি যে এই প্রবন্ধে ‘সৃষ্টি’ শব্দটি প্রধানত সচেতন সত্বার অভিপ্রায়যুক্ত নির্মাণ বা তৈরী অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শব্দটি শুধু নির্মাণ বা তৈরী অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ স্রষ্টার কোন স্বরূপ না ধরে নিয়েই। প্রসঙ্গ অনুযায়ে এটা পরিস্কার হয়ে যাবে কোন অর্থে ‘সৃষ্টি’ বলা হচ্ছে।

সৃষ্টির যুক্তির (সৃষ্টি থাকলেই সৃষ্টিকর্তা) একটা ত্রুটি হল, যে এটা কোন যুক্তি নয়, এটা দ্বিরুক্তি মাত্র। সৃষ্টি থাকা আর স্রষ্টা থাকা একই কথা। কাজেই সৃষ্টি আছে অতএব সৃষ্টিকর্তা আছেন, এই যুক্তি হল যা প্রমাণসাপেক্ষ্য (অর্থাৎ স্রষ্টা আছেন) তাকে ধরে নিয়ে সেটাই প্রমাণ করার একটা চক্রাকার চেষ্টা। কোন বস্তুর অস্তিত্ব সচেতন সত্বার অভিপ্রায়মূলক কর্ম বা প্রাকৃতিক নিয়মের ফল - এই দুই এর দ্বারাই সম্ভব। সৃষ্টির যুক্তি একটি প্রকৃত যুক্তি হলে, আমাদের কাছে যা সৃষ্ট বা Designed বলে মনে হয়, তা যে আসলেই সৃষ্ট (সচেতন সত্বার দ্বারা) সেটাই প্রমাণ করত । কিন্তু সৃষ্টির যুক্তি তা করেনা। সৃষ্টির যুক্তির এই সহজ অথচ সূক্ষ্ম ত্রুটি অনেকের কাছেই ধরা পড়েনা। তার কারণ মনে মনে অনেকেই স্রষ্টা আছেন এটা একটা স্বতসিদ্ধের মতই ধরে নেন। অনেকটা স্বজ্ঞাত (Intuitive) ভাবেই। কিন্তু যুক্তিশাস্ত্রে স্বজ্ঞাত ধারনার স্থান নেই। কারণ স্বজ্ঞাত ধারনা কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে। ইতিহাসে এর বহু নজীর আছে। যেমন পৃথিবী সমতল, বা সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, এই ধারনাগুলো একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। যুক্তিাস্ত্রে শুধু অভ্রান্ত যুক্তি ও প্রমাণ বা সাক্ষ্যই (Logic and Evidence) গ্রহণযোগ্য। যুক্তি হতে হবে হেত্বাভাস (Fallacy)মুক্ত। যুক্তির অভ্রান্ততা নিশ্হিত করার প্রণালী যুক্তিশাস্ত্রেই আছে। এবং প্রমাণ বা সাক্ষ্যের (Evidence) অভ্রান্ততা যাচাই এর জন্য চাই পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের (Test and Observation) মাধ্যমে সার্বজনীন মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা।

আস্তিকদের সৃষ্টির যুক্তির আরেকটা ত্রুটিপূর্ণ দিক আছে যেমন :

১। বিশ্বের শৃঙ্খলা বা বিধিনির্দিষ্টতার কারণ হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা।
২। ঈশ্বর নিজে অসৃষ্ট, আবশ্যকীয় ভাবে অস্তিমান (existing necessarily) এবং সদা বিরাজমান (অনন্ত অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত) এই দাবী করা।

উপরোক্ত ২ নং অনুযায়ী ঈশ্বর এর অস্তিত্ব বিশ্বে শৃঙ্খলা বা বিধিনির্দিষ্টতা থাকা বা না থাকার ওপর নির্ভর করেনা, কারণ ঈশ্বর সদা বিরাজমান । কাজেই ১ নং এর ত্রুটি এবং ২ নং এর সঙ্গে এর অসঙ্গতি এখানেই ধরা পড়ে। তাছাড়া বিশ্বের সবকিছু সৃষ্ট পরিলক্ষিত হওয়াটাও মানুষের মনের একটা পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা। এর কারণ আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আর আমাদের চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকতা। যেমন একটা ঘড়ি দেখলে আমরা তৎক্ষনাৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে এটি মানুষ সৃষ্ট, কারণ আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে অনুরূপ আর একটি ঘড়ি মানুষের দ্বারাই তৈরী হয়েছিল। অথবা ঘড়িটির ভেতরের স্প্রিং বা চাকা দেখেও অনুমান করা যায় যে এটি মানুষের তৈরী, কারণ পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে যে স্প্রিং বা চাকা মানুষের তৈরী। কাজেই সৃষ্টির যুক্তি একটা অভিজ্ঞতা ও প্রসঙ্গ ভিত্তিক ধারনা থেকে উদ্ভুত। কাজেই যা কিছুই সৃষ্ট বলে প্রতিভাত হয় তাই সচেতন কোন স্রষ্টার ইচ্ছাপূর্বক ক্রিয়ার ফল, এই যুক্তিটা হল পরিচিত অভিজ্ঞতা থেকে আরোহী যুক্তির (Inductive Logic) মাধ্যমে উপনীত এক সিদ্ধান্ত। আরোহী যুক্তির অভ্রান্ততা সকল ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা যায় না।

জগতের যাবতীয় বস্তু ও প্রপঞ্চ (Phenomenon) কে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম শ্রেণীর বস্তু হল যা কিছু মানুষ সৃষ্ট (বিশেষ করে কোন উদ্দেশ্যের কারণে) বলে প্রতীয়মান হয় (একই রকম বস্তু মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতার দরুন), যেমন ঘড়ি, গাড়ী ইত্যাদি, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু হল যা কিছুই অক্রমিক (Random) ,সম্ভাবনাশ্রয়ী (probabilistic) বা প্রকৃতিজনিত, এক কথায় অসৃষ্ট, অর্থাৎ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নয় এমন বস্তু সমূহ, যেমন পাথরের টুকরো, মেঘ, রংধনু ইত্যাদি। কিছু বস্তু আছে যা আস্তিকরা সৃষ্ট বলে গণ্য করে আর নাস্তিক ও যুক্তিবাদীরা অসৃষ্ট (অক্রমিক বা প্রকৃতিজনিত) হিসাবে গণ্য করে, যেমন পশুপ্রাণী, মানুষ। এই নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনায় যাব। কাজেই আমাদের এই মানষিক মানচিত্র অনুযায়ী জগত সৃষ্ট ও অক্রমিক এই দুই শ্রেণীর বস্তু ও প্রপঞ্চ সমন্বয় গঠিত, যার সাহায্যে আমরা আরোহনের (Induction) মাধ্যমে যাদৃচ্ছিক (arbitrary) যে কোন বস্তু সৃষ্ট না অক্রমিক, এই বিচার করতে পারি। কিন্তু এই আরোহী সামান্যীকরণ (Inductive Generalization) সমগ্র বিশ্বের মত চূড়ান্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অর্থবহ হতে পারেনা। কারণ আমরা একটা বিশ্বকেই জানি। একই রকম অনেক বিশ্বের নজীর আমদের জানা নেই যাতে করে আমরা আরোহনের মাধ্যমে *আমাদের এই* পরিচিত বিশ্ব যে সৃষ্ট, সেই বিচার করতে পারি, কারণ আমাদের বিশ্বের স্বরূপ *অন্য* কোন বিশ্ব যে কোন স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট এমনটি আমাদের জানা নেই। তাই আমাদের এই বিশ্ব যে কোনও স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিভিত্তিক নয়, বরং বিশ্বাস ভিত্তিক। তাছাড়া আমাদের বিশ্বে সৃষ্ট ও অক্রমিক, এই দুই শ্রেণীর বস্তুই আছে। সৃষ্ট জগতে অক্রমিক অর্থাৎ অসৃষ্ট বস্তু থাকলে সঠিক অর্থে এটা বলা ভুল হবে যে জগতটা সৃষ্ট। এবারে আসি মানুষ ও প্রাণী (অর্থাৎ প্রাণ) স্রষ্টা সৃষ্ট না প্রকৃতি সৃষ্ট সেই প্রশ্নে। প্রাণী বা প্রাণ কে আস্তিকরা সৃষ্ট বস্তু বা প্রপঞ্চ বলে গণ্য করার কারণ হল যে পাথর বা মেঘে কোন অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা অর্থ দেখা যায়না, যেমনটি প্রাণ বা প্রাণীতে দেখা যায়। আস্তিকরা উদ্দেশ্যহীন বা অর্থহীন বস্তু প্রকৃতি সৃষ্ট বলে যেমন গণ্য করেন, তদ্রূপ উদ্দেশ্য বা অর্থ পূর্ণ বস্তুকে সচেতন সত্বার সৃষ্ট বলে গণ্য করেন। কিন্তু এইরকম চিন্তা বা যুক্তি ভ্রমশূন্য নয়। কোন বস্তু বা প্রপঞ্চ সচেতন স্রষ্টার সিসৃক্ষার কারণে সৃষ্ট আর কোনটি প্রকৃতির নিয়মে বা অক্রমিক ভাবে সৃষ্ট এই সিদ্ধান্তটা মূলত অধ্যাত্মীয় (Subjective). সোজা কথায় মনের ব্যাপার। কোন বস্তুর মধ্যে অভিপ্রায়ের আভাস দেখলে আমরা সেই বস্তু স্রষ্টার সৃষ্ট বলে মনে করি এবং আভাস না দেখলে মনে করি প্রকৃতির সৃষ্ট। কিন্তু এটা কি ভ্রমশূন্য ? কিছু উদাহরণেই এর উত্তর মিলবে। একটা বিমূর্ত চিত্রই ধরা যাক। এটা যে কোন বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা সেটা আগে ভাগে জানা না থাকলে এটা মনেই হতে পারে যে চিত্রটা অনবধানতা বা দুর্ঘটনা বশত রং ছিটানর কারণে সৃষ্ট। কারণ এতে কোন অভিপ্রায়েয় আভাস পাওয়া যায়না। অপরদিকে এটাও সম্ভব যে কোন শিল্পীর অনবধানতাবশত রং ছিটানর কারণে অনভিপ্রেত সৃষ্ট ছবিও একজন নামী শিল্পীর যত্ন সহকারে অঙ্কিত চিত্র বলে মনে হতে পারে, যদি ছবিটির সৃষ্টির নেপথ্য কাহিনী জানা না থাকে ! নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী ওয়াইনবার্গ এই সত্যটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন :

> ‘যে বিশ্ব একেবারে বিশৃঙ্খল, বিধিবিহীন, তেমন একটি বিশ্বকেও কোন মূর্খের সৃষ্ট বলে মনে করা যেতে পারে ’

কাজেই ধারা বা নিয়মের (pattern or regularity) সাথে যেমন সচেতন স্রষ্টার অভিপ্রায়ের কোন আবশ্যিক যোগসূত্র নেই, তেমনি অক্রম (randomness) বা বিশৃঙ্খলার সাথে সচেতন স্রষ্টা বা স্রষ্টার অভিপ্রায় না থাকারও কোন আবশ্যিক যোগসূত্র নেই।

এটা জানা আছে যে প্রকৃতির নিয়মের (অর্থাৎ বিজ্ঞানের নিয়মের) পরিণতিতে দুই রকম বস্তু বা প্রপঞ্চের উৎপত্তি হতে পারে, যার একটা আমাদের কাছে অক্রমিক বা এলোমেলো মনে হয়, আর অন্যটা উদ্দেশ্যপূর্ণ, অর্থবহ ও তথ্যসমৃদ্ধ মনে হয়। প্রকৃতির নিয়মের ফলে কি ধরনের বস্তুর উৎপত্তি হবে তা নির্ভর করে প্রকৃতির নিয়ম কিভাবে এবং কত সময় ধরে কাজ করছে তার ওপর। যেমন মেঘ ও রংধনু দুটোই বিজ্ঞানের নিয়মের পরিণতিতে সৃষ্ট। এলোমেলো মেঘকে আমরা কখনই সচেতন সত্বার সৃষ্ট বলে মনে করিনা। রংধনু বা সুন্দর ফুলকে সচেতন সত্বার সৃষ্ট বলে আমরা কিছুটা মানতে পারি। আমাদের মনোরন্জনের জন্যই যেন রংধনুর সৃষ্টি, বা প্রেম বা কাব্যের সুবিধার্থেই ফুলের সৃষ্টি ইত্যাদি। অপরদিকে মানুষকে সচেতন সত্বার সৃষ্ট বলে অনেকে শুধু মনেই করেনা, সচেতন সত্বা ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয় বলেও ঘোষণা দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এলোমেলো মেঘ থেকে সুন্দর রংধনু, তা থেকে প্রাণী পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান কোন গুন বা ধর্ম আছে যা আমাদের ধারনাকেও ক্রমে ক্রমে পাল্টাচ্ছে ব প্রভাবিত করছে। কি এই গুণ? জটিলতা তত্ত্বে (Complexity Theory) বা তথ্যবিজ্ঞানে (Information Theory) তথ্যের গভীরতা (Depth of Information) বলে একটা ধারনা আছে, যার সঠিক সংজ্ঞা এখানে দেয়া যাচ্ছেনা। এই সেই ধর্ম। প্রাণের তথ্যের গভীরতা সবচেয়ে বেশী। এই তথ্যের গভীরতার তারতম্যের জন্যই কোন বস্তুকে অসৃষ্ট, আবার কোনটিকে সৃষ্ট মনে হয়। মানুষের তথ্যের গভীরতা তার বংশাণু-সমষ্টি (Genome) তে নিহিত, যা আবার মানুষের জীবদ্দশায় মস্তিষ্কের বিকাশের (ঊর্দ্ধ মস্তিষ্কে বর্তনী বা Synaptic Circuits গঠনের মাধ্যমে) সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

কিন্তূ এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে তথ্যের গভীরতার তারতম্য পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মেই ঘটে। প্রাণ সৃষ্টির মূলেও আছে পদার্থবিজ্ঞানের বিধি। কিন্তু রংধনুর মত প্রাণ এক ধাপে বা অল্প সময়ের ক্রিয়ায় সৃষ্ট নয়। প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে কোটি কোটি বছর ধরে ছোট ছোট ধাপে পদার্থবিজ্ঞানের বিধির প্রয়োগের দ্বারা, যা বিবর্তন নামে পরিচিত। বিবর্তন প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) ও পরিব্যক্তি (Mutation), এই দুই মৌলিক ক্রিয়ার দ্বারা ঘটে। বিবর্তনের দরূনই তথ্যের গভীরতা বাড়তে বাড়তে এক পর্যায় জড় বস্তু থেকে জৈব বস্তু (যেমন DNA অণু), ডি.এন.এ থেকে এককোষী প্রাণী, ক্রমে ক্রমে জটিলতর প্রাণী এবং এক পর্যায়ে মানুষ প্রাণীর মাঝে আত্মসচেতনতার (Self-Consciousness) উদ্ভব হয়।

কিন্তু এটা বলা ঠিক হবে না যে প্রাণ সৃষ্টির বিশদ ব্যাখ্যা জানা হয়ে গেছে। আবহাওয়া পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হয়, আর পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম ও আমাদের জানা। তবুও আবহাওয়ার পূর্বাভাস আমরা ভ্রমশূন্যতার সাথে (Accurately) করতে পারিনা। ছায়াপথ (Galaxy) ও পদার্থবিজ্ঞানের

নিয়মেই সৃষ্ট, কিন্তু ছায়াপথ গঠনের বিশদ ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা এখনও জানেন না। প্রাণ, আবহাওয়া, ছায়াপথ এ সবই হল বিশৃঙ্খল তন্ত্রের (Chaotic System) উদাহরণ। বিশৃঙ্খল তন্ত্রের আন্তর্নিহিত জটিলতার জন্যই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম নিখুত ভাবে জানা থাকলেও এই তন্ত্রসমূহের বিস্তারিত জানা সম্ভব নয়।

কাজেই যদিও প্রাণ বা প্রাণী আমাদের নিকট এক আশ্চর্য্যজনক বলে মনে হয়, যার সৃষ্টি সাধারণ বোধশক্তিতে গভীর রহস্যাবৃত, যার কোন আপাত ব্যাখ্যা নেই বলে মনে হয়, কিন্তু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে প্রাণ সৃষ্টির একটা সম্ভাব্য এবং বিশ্বাসযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব। রহস্যটা প্রাণের সৃষ্টিতে নয়, বরং পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের উৎসের প্রশ্নে। কারণ দেখা যাচ্ছে সব বস্তু বা প্রপঞ্চের মূলে আছে পদার্থবিজ্ঞানের অমোঘ বিধি। প্রকৃত অর্থে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মই যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র আসলো কোথা হতে? পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের স্রষ্টা কি বা কে? চূড়ান্ত রহস্য থেকেই যাচ্ছে। আস্তিকরা বলেন যে ঈশ্বরের কোন স্রষ্টার প্রয়োজন নেই, ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ। সেই একই যুক্তিতে দাবী করা যায় যে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রেরও কোন স্রষ্টার প্রয়োজন নেই। এই দাবী ঈশ্বরের কোন স্রষ্টার প্রয়োজন নেই ঐ দাবীর চাইতে কোন অংশেই কম বিশ্বসযোগ্য নয়। কিন্তু প্রকৃত সত্য কোনটা সেটা এখনও যুক্তি তর্কের বাইরে।

এইবার আসি বুদ্ধিমান সৃষ্টির যুক্তিতে, যাতে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের ধারণা ব্যবহার করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। প্রাণের সৃষ্টির জন্য কতকগুলো ধ্রুবকের সূক্ষ্ম সমন্বয় যেহেতু খুবই অসম্ভাব্য মনে হয়, সেহেতু বুদ্ধিমান স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা বলা হয়। কিন্তু এই যুক্তিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ। এই ত্রুটির কারণ হল, পরিসংখ্যান সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান এবং কার্য কারণের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা প্রসূত স্বজ্ঞাত ধারণার অপপ্রয়োগ। প্রথমোক্ত কারণের উদাহরণ দেয়া যাক। দশটা ছক্কার ঘুঁটি একই সাথে ফেললে ৬৫২৬৫৫৩২১৪ হয়ার সম্ভাবনা আর ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬ হয়ার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ এক, আর এর যে কোন একটি হয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষুদ্র। এই সম্ভাবনার মান হল = (১/৬)X(১/৬)X(১/৬)X(১/৬)..... (১/৬ কে দশবার গুন করার ফল)। কিন্ত ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬ হলে আমরা খুব আশ্চর্য্যান্বিত হই, আর এই ফলের সাথে কোন বড় পুরস্কার জড়িত হলেতো দৈব হস্তক্ষেপের আভাস খুঁজে পাই। আর ৬৫২৬৫৫৩২১৪ হলে এক মামুলী ব্যাপার মনে হয়, যদিও দুটোর ঘটার সম্ভাবনার মান সম্পূর্ণ এক। সম্ভাবনার একটা বৈশিষ্ট হল যে পরিসংখ্যানে সময় ও সংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পর্যাপ্ত সময় দিলে স্বল্প সম্ভাবনার কোন ঘটনাও ঘটতে বাধ্য। বা স্বল্প সম্ভাবনার একই রূপ অনেক ঘটনা একসাথে ঘটানোর চেষ্টা করলে, কোন একটা চেষ্টা সফল হতে বাধ্য। যেমন একজন মানুষ ১০টি ছক্কার ঘুঁটিকে যদি ৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬ বার ফেলে তাহলে ফলাফল একবার ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬ (বা ১১১১১১১১১১) হতে বাধ্য। তেমনি ৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬ জন মানুষ যদি একই সাথে ১০টি ছক্কার ঘুঁটি ফেলে তাহলে একজনের ফল ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬ হতে বাধ্য। পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টির ব্যাপারটিও অনেকটা তাই। মহাবিশ্বে কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র অছে। আমাদের জানামতে কেবল একটিতেই প্রাণ সৃষ্টর জন্য প্রয়োজনীয় সব শর্তাদি পূরণ হয়েছে। এটা অনেকটা ৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬ জন মানুষের

একই সাথে ১০টি ছক্কার ঘুঁটি ফেলার মত ব্যাপার। আমাদের পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি একজনের ফল ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬ হওয়ার মতই ঘটনা। এত সংখ্যক গ্রহ আছে যে একটাতে প্রাণের সৃষ্টি হতে বাধ্য। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের কয়কটি মৌলিক ধ্রুবকের মানের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের ব্যাপারটা? যার জন্য প্রাণের সৃষ্টি আদৌ সম্ভব (পৃথিবী হোক বা অন্য কোন গ্রহেই হোক), তার কি ব্যাখ্যা? আমরা তো একটাই বিশ্ব আছে বলে জানি। তাই পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক ধ্রুবকগুলির মানের সূক্ষ্ম সমন্বয় অনেক সংখ্যক বিশ্বের অস্তিত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এখানে একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার লক্ষ্য করার মত। সেটা হল, এটা মনে করা ঠিক নয় যে পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক ধ্রুবকগুলির প্রকৃত মানের পূর্বনির্ধারিত সম্ভাবনা (Apriori Probability) ধ্রুবকগুলির অন্য কোন মানের পূর্বনির্ধারিত সম্ভাবনা এক। অর্থাৎ ধ্রুবকগুলির সব মানই সমসম্ভব (equally probable) এটা ধরে নেয়ার কোন কারণ নেই। এটা নীতিগতভাবে সম্ভব যে পদার্থবিজ্ঞানের চূড়ান্ত বা ব্যাপক তত্ত্ব (Theory of Everything), যা এখনো আমাদের জানা নেই সেই তত্ত্ব ধ্রুবকগুলির এমন এক মান বেঁধে দেয়, যা এখনকার প্রকৃত মানের সমান। অর্থাৎ সূক্ষ্ম সমন্বয় যে পদার্থবিজ্ঞানের চূড়ান্ত তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী ফল সেটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সূক্ষ্ম সমন্বয়ের আর একটা ব্যাখ্যা হল, কোন কোন সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের বিশ্বই একমাত্র বিশ্ব নয়। আমাদের বিশ্বের সমান্তরাল অগুনতি অনেক বিশ্ব আছে। পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক ধ্রুবকগুলির মান বিভিন্ন বিশ্বে বিভিন্ন হতে পারে। শুধু একটি বিশ্বেই মানগুলি প্রাণ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম সমন্বয়ের মানের সমান, সেটাই আমাদের বিশ্ব। এটা অনেক গ্রহের মধ্যে পৃথিবীতেই প্রাণের সৃষ্টির মত ব্যাপার। মোটকথা বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করে যুক্তি সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করলে বিশ্ব বা প্রাণের সৃষ্টির জন্য সচেতন সত্বার চেয়ে বৈজ্ঞানিক বা প্রাকৃতিক কারণই অধিক যুক্তিযুক্ত। বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ দ্বারা ঈশ্বরের (সচেতন স্রষ্টার) অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। তবে বিশ্বাস টেনে আনলে সে আর এক কথা।

পড়ুন লেখকের অন্যান্য যুক্তিবাদী প্রবন্ধ ঃ

- ধর্মই কি নৈতিকতার উৎস?
- স্বাধীন ইচ্ছা, মন্দ ঈশ্বরের অস্তিত্ব

প্রবন্ধটি মুক্ত-মনায় প্রকাশিত এবং সংকলিত - মডারেটর, মুক্তমনা